**ATMADEEP**

An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
**ISSN: 2454–1508**
Volume- I, Issue- IV, March, 2025, Page No. 888-895
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
**DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.04W.081**

# বনফলু: এক প্রেমানুভবী শিল্পী সত্ত্বা

**দেবশ্রী পণ্ডা রায়**, *বাংলা বিভাগ, সাঁওতাল বিদ্রোহ সার্ধশতবার্ষিকী মহাবিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 21.03.2025; Send for Revised: 25.03.2025; Revised Received: 27.03.2025; Accepted: 28.03.2025; Available online: 31.03.2025
©2025 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

**Abstract**

*Banaful, a poet, a sensitive artist, whose soul's humanitarian appeal is woven with threads of love. Balaichand's tales are not so much about romantic love, but rather a profound subdued yearning. In his stories, we can see the sweet, idealized form of conjugal love. At the same time a stark realistic portrayal of married is also found. The main reason as he explores in his stories is the financial struggle and racism. There are numerous factors underlying the social dynamics of male-female social relationships. Banaful's tales evoke a yearning for the union of loved that transcends its fulfillment stirring the mind with the poignant sorrow of separation. It can be said that his characters are compelled to relinquish their love in deference to social obligations. Not everyone can defy societal and familial norms to give their love a lasting culmination. The sweet memories of youth's tender union are scattered, carried away by the autumnal winds of age, alongside the withered leaves. Banaful's tales frequently conclude on a melancholic note, imbuing the character's lives with a poignant romantic nostalgia. Balaichand, amidst the contemporary tough time, has cherised life and rested in the shade of his own existence. There is discernible tendency for our thoughts to be influenced by a lingering hesitation, veiled by conventional ideologies. Among these, the fictionalized portrayal of Balaichand's nature akin to a gentle breeze has been revealed through his storytelling.*

***Key Words**: Romantic, Love, Separation, Love Experience, Revelation*

সৃষ্টি সূচনার শুভলগ্নে পৃথিবীতে এল প্রথম পুরুষ আদম্ ও প্রথম নারী ইভ্। এদের মিলনের ফসল হিসেবে সৃষ্টি হল মানব সভ্যতার। তখন সেই 'গহন কুসুমকুঞ্জ মাঝে' পাখির কলতানই হয়ে উঠেছিল মধুর ধ্বনি। সমস্ত বাঁধন খুলে হৃদয়ের কুণ্ঠিত কথা কণ্ঠনালি বেয়ে সমর্পিত হতে চাইল অন্যের বাহুডোরে। একাকিনী কাননে সোনালি রোদের খেলা আর পরস্পরের প্রতি স্পৃহাহীন আত্মগত সমর্পণ সভ্যতার ইতিহাসের অগ্রগতির বার্তা বহন করে আনল। তার বহুযুগ পরে কবি সমস্ত কাজের মধ্যে উচ্চারণ করলেন— "প্রেমের জোয়ারে ভাসাবে দোঁহারে।" এই 'দোঁহা' বা 'দুহু'র ভাবনা যদি প্রেমের একক রূপে ধরা যায় তবে পদাবলীর চণ্ডীদাস হয়ত বা সেই ভাবনা তাড়িত হয়ে তাকে বিশ্বময় ব্যাপ্ত করার উচ্চারণ করেন—

'শুনহ মানুষ ভাই,
সবার উপরে মানুষ সত্য
তাহার উপরে নাই।'[১]

নরনারীর মিলনের সংকীর্ণ ভাবনায় বাঁধনকে ছিন্ন করে বিশ্ব কবির গানের পংক্তিগুলি অজান্তেই মনের মধ্যে গুনগুন করে ওঠে—

"বিশ্বসাথে যোগে যেথায় বিহারো
সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমারো
নয়ক বনে, নয় বিজনে,
নয়ক আমার আপনমনে,
সবার যেথায় আপন তুমি, হে প্রিয়
সেথায় আপন আমারো।"[২]

শিল্প-সাহিত্যের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রেম হল অন্যতম উপজীব্য বিষয়। আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান প্রেমের অনুভূতিকে শারীরবৃত্তিয় প্রক্রিয়া বলে ব্যাখ্যা দেয়। এ সত্ত্বেও বলা যায় শিল্পীর তুলি আর সাহিত্যিকের লেখনীতে পাঠকের দরবারে তা উপস্থিত হয় বিচিত্র রূপ, রস গন্ধ ও অর্থবহ ব্যঞ্জনায়। কবি সাহিত্যিকরা প্রেমের ভুবন নিয়ে বিচিত্র দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে অনুভববেদ্য আলেখ্য রচনা করেন।

বনফুল এরকমই একজন অনুভবী শিল্পী ব্যক্তিত্ব। যাঁর মানবিক আবেদন প্রেম ভাবনাকে করে তুলেছে বর্ণময়। বলাইচাঁদের গল্পে প্রেম নিছক রোম্যান্টিক ভাবনাজাত বিষয়ক নয়। তাঁর গল্পে দাম্পত্য প্রেমের মিঠে রূপ যেমন আমরা দেখতে পাই তেমনি বিবাহের পরিণতি না পাওয়া সম্পর্কের চিত্রও বড় বেশি করে দৃষ্টিগোচর হয়। এর মূল কারণ স্বরূপ অর্থনৈতিক ও বর্ণবৈষম্যকেই তুলে ধরছেন লেখক তাঁর গল্পে। আরও বিবিধ বিচিত্র কারণ নর-নারীর সম্পর্কের সমাজস্বীকৃত পরিণতিতে প্রাচীর হয়ে দাঁড়িয়েছে।

"মিলনে আছিলে বাঁধা শুধু এক ঠাঁই,
বিরহে টুটিয়া বাধা
আজি বিশ্বময় ব্যাপ্ত হয়ে গেছ প্রিয়ে।"[৩]

রবি কবির এই ভাবনা ভালোবাসার ভুবন সম্পর্কে কতটা সার্থক তা বলা সহজ নয়। তবে বনফুলের গল্পে প্রেমের মিলনাত্মক পরিণতির চেয়ে বিরহ পাঠকের মনকে বিচলিত করে তোলে। বলা যেতে পারে তাঁর প্রেমমূলক গল্পের চরিত্ররা নিজেদের মনের মানসীকে প্রাপ্তির আনন্দ বলি দিয়েছে সমাজের যূপকাষ্ঠে।

"তুমি বিয়ত্রিচের গল্প শুনেছ? যার প্রেমে দান্তে পাগল হয়েছিলেন? শোননি? জোহান যোয়ারের লাইফ পড়েছে? যাতে সেই স্কুল মাস্টার? তাও শোন নি? বেশ, কেষ্ট-রাধার কথা তো জান? এবার ভেবে দেখ দিকি
সেই যমুনার কূলে—"
এবার রমণী বলিল— "আমরা হলাম কৈবর্তের মেয়ে" উদ্বেলিত হৃদয়ে বলিলাম— "হোক, তাতে ক্ষতি সেই। দোহাই তোমার, একটু কাছে সরে এসো।"

বলিয়া তাহার হাত চাপিয়া ধরিলাম এক ঝটকায় হাত ছাড়াইয়া লইয়া সে আরও খানিকটা সরিয়া গেল। আমিও তৎক্ষণাৎ আবার তাহার কাছে গিয়া বসিলাম।
বৃষ্টি শুরু হইয়া গেল। গ্রাহ্যের মধ্যেই আনিলাম না। বলিলাম— "দেখ জীবন খুব ছোট—এই ক্ষুদ্র জীবনে যে শুভ মুহূর্তটি এসেছে নষ্ট কোরো না তাকে। শুনছ? যত টাকা লাগে।"[৪]

—পরস্পর হৃদয় সংবাদী দুই নর-নারী জীবনের ঘ্রাণকে আস্বাদ করতে উন্মুখ 'স্থূলের স্মৃতি' গল্পে।

মনোগহনের প্রস্ফুটিত হৃদয়কুসুম ভালোবাসার সৌরভে আবিষ্ট হয়ে, যতদূর সম্ভব মোলায়েম কণ্ঠে গান গেয়ে উঠল—

> "বুলবুলি তুই ফুল শাঁখাতে
> দিসনে আজি দোল বাগিচায়।"
> "ওকি, অমন করছ কেন?"
> ঝপাং করিয়া ধস ভাঙিল।
> হিসাব করিয়া দেখিলাম, সাড়ে তিন সেকেণ্ড স্থূলাঙ্গিনী আমার কণ্ঠলগ্না অবস্থায় ছিল। এতদুপলক্ষে আমরা উভয়েই স্থূলদেহধারণ করিয়াছি; কিন্তু স্কুলের স্মৃতিটি আজিও মর্মমূলে হূলের মতো বিঁধিয়া আছে।"[৫]

বস্তুত সমাজের এই মিথ্যে আভিজাত্যের অহংকারকে লেখনীর শলাকা দিয়ে বিদ্ধ করেছেন লেখক। গীতায় স্বয়ং কৃষ্ণ বলেছিলেন—

> "চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ।"[৬]

দেশকালকে অতিক্রম করে যুগে যুগে সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদ ও জাতিভেদ প্রথা বিদ্যমান। অধুনা-কাল অবধি এই প্রথা সমাজ জীবনের বিস্তৃতপটে সহজাত ভাব প্রকাশের ক্ষেত্রে বাধার প্রাচীর দাঁড়িয়েছে। বিশেষ করে নরনারীর প্রণয় যখন সামাজিক জাতিভেদ প্রথার রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করেছে—তখন অধিক ক্ষেত্রে বিচ্ছেদই অনিবার্য পরিণতি রূপে পরস্পরের জীবন প্রবাহকে ভিন্ন গতি প্রবাহী করে তুলেছে। বেদ-পুরাণের যুগেও অসবর্ণ বিবাহের চিত্র দেখতে পাওয়া যায়। শুধু ভারতবর্ষ নয় পৃথিবীর প্রাচীন নানা গ্রন্থে অসবর্ণ বিবাহের নিদর্শন আমরা পাই। ভিন্ন-জাতি বা ধর্মে বিবাহ ধর্মীয় দিক থেকে স্বীকৃত। কিন্তু বারবার এক্ষেত্রে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছেন সমাজবেত্তাগণ।

সবাই সমাজ ও পরিবারের অনুশাসনকে ভেঙে ফেলে সম্পর্ককে পরিণতির পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে নি। যৌবনের স্মৃতি মধুর মিলনাকাঙ্ক্ষা ঝরে পড়েছে বার্দ্ধক্যের পাতাঝরার সঙ্গে সঙ্গে। প্রখর সমাজ-সচেতন শিল্পী বনফুলের বেশিরভাগ প্রেম ভাবনাজাত গল্পগুলির চরিত্ররা জীবন উপান্তে এসে স্মৃতিমধুরতাকে রোমন্থন করেনি। বরং জীবনের বিবর্ণ পাতাগুলি তাদের জীবন সায়াহ্নকে ভারাক্রান্ত করেছে।

বনফুলের গল্পে, আধুনিক শিক্ষিত নারী-পুরুষ অনেক সময় পরিবারের বিরুদ্ধে গিয়ে সমস্ত সংস্কারের উর্দ্ধে উঠে নিজেদের প্রেমকে সামাজিক প্রতিষ্ঠা দিতে পারেনি।

পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর নিজের মনের বার্তা সবসময় প্রাধান্য পাবে না এটাই স্বাভাবিক। শিক্ষিতা, আলোকপ্রাপ্তা, সুরুচি সম্পন্না আধুনিক নারীও কৈশোরের প্রেমকে পরিবারের বিরুদ্ধে গিয়ে পরিণতি দিতে পারেনি। তা ছাই চাপা আগুনের মত মনোগহনে চাপা পড়েছিল। 'ঘটনাচক্র' গল্পের শ্রীমতী উষা নাম্নী চরিত্রের বাবা অন্নদাবাবু যখন শুনলেন—

> "তাঁহার কন্যা মনীন্দ্রমোহন নামক সহপাঠী কৈবর্তযুবকের প্রতি আকৃষ্ট হইতেছে, তখন কাল বিলম্ব করিলেন না। বংশ, কুল, কোষ্ঠী, গণ প্রভৃতি দেখিয়া, শ্রীমান ব্রজবিহারী গুপ্তের হস্তে শ্রীমতী উষাকে সমর্পণ করিয়া স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলেন। ব্রজবিহারী বছর, তিনেক হইল ডাক্তারি পাস করিয়া কলিকাতার রোগীসমুদ্রে পাড়ি জমাইবার চেষ্টায় আছেন। পাড়ি এখনও তেমন জমে নাই। বিবাহের সময় উষা, বাধা দিতে পারেন নাই। মনের সে দৃঢ়তা তাঁহার ছিল না। অত্যন্ত মৃদু নরম মন। এই জন্যই আত্মহত্যা করিবার সঙ্কল্পটাও সুগোপন সঙ্কল্পই রহিয়া গেল— কার্যে পরিণত হইল না।"[৭]

'ঊষা' দেবী মনীন্দ্রকে ভালোবেসে কোনো সঙ্কল্পই রাখতে পারেন নি। মনীন্দ্রমোহন জর্জেটের শাড়ি ভালোবাসতেন। উষাদেবী সঙ্কল্প করেছিলেন জর্জেট আর পরবেন না। কিন্তু জর্জেটের খুব চল হওয়ায় তাঁর প্রতিজ্ঞা ভাঙতে বসেছিল।—

কিছুদিন পর বান্ধবী ছায়া এসে খবর দিল মনীন্দ্রবাবু কলকাতায় এসেছে।

> "ঠিকানাটি হাতে করিয়া উষা দেবী নির্বাক হইয়া বসিয়া রহিলেন। এত কাছে মনি আসিয়াছে। কলেজের অর্ধবিস্মৃত সেই দিনগুলি আবার মনের মধ্যে ভিড় করিতে লাগিল। সেই অতীত দিবসগুলির মাদকতায় সমস্ত অন্তঃকরণ আবার যেন আবিষ্ট হইয়া গেল। সেই ভীরু ভিতু মানুষটি শান্ত নিরীহ নিরহঙ্কার। মনীন্দ্রমোহনের মুখখানা সে যেন মনের ভিতরে সুস্পষ্ট দেখিতে পাইতেছিল।"[৮]

কৈশোরের প্রেমের কণ্ঠ রুদ্ধ হয়েছিল বাস্তবের নিঠুর অভিঘাতে। জর্জেট শাড়ির অনুষঙ্গে প্রতিহত প্রেমের মর্ম বেদনা বারংবার মনের মণিকোঠায় গুমরে উঠছিল। সমস্ত বাধার নিগড়কে ঠেলে ফেলে সে তার সোচ্চার প্রকাশের পদক্ষেপ ঘোষণা করতে পারে নি।

'অধ্যাপক সুজিত সেন' গল্পে ঠিক বিপ্রতীপ ছবিটি পরিলক্ষিত হয়। সাম্প্রদায়িকতার উর্দ্ধে উঠে বনফুলই যেন অধ্যাপক 'সুজিত সেনের' মেয়ে সুমিতা আর উসমান খাঁ-র মিলনের মধ্য দিয়ে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির প্রতিষ্ঠা করেছেন। অধ্যাপক সুজিত সেন—

> "হিন্দু-মুসলমানের মিলন তিনি সর্বান্তঃকরণে কামনা করেন।
> এ নিয়ে অনেক প্রবন্ধ লিখেছেন, বক্তৃতাও দিয়েছেন। কিন্তু তাঁর মেয়ে একজন মুসলমানকে বিয়ে করেছে এতে তিনি খুশি হলেন না। মেয়ের দিকে চেয়ে দেখলেন মেয়ে আনত চক্ষে দাঁড়িয়ে আছে। মুখে মুচকি হাসি।
>
> হঠাৎ পাশের ঘরে চলে গেলেন। পাশের ঘর থেকে ফিরে এলেন একটি রিভলবার নিয়ে।
> মেয়েকে বললেন বিবাহে কিছু যৌতুক দিতে হয়। এইটি নাও। যে পথে তুমি পা বাড়িয়েছ সে পথে অনেক বিপদ। বিপদে পড়লে এটি তোমার কাজে লাগতে পারে। রিভলবারটি দিয়ে বেরিয়ে গেলেন তিনি ঘর থেকে।"[৯]

পাঠকের মনের বিপরীত সম্ভাবনার জাল ছিন্ন করে সুজিত সেন মেয়ের সিদ্ধান্তের প্রতি প্রচ্ছন্ন, সমর্থন জানিয়েছেন। জাতের মোহকে অন্তরে অবদমিত করে সুজিত সেন সম্প্রীতির বার্তা বাহক হয়ে উঠেছেন।

বাল্য প্রেমের সারল্যের পরিচয় পাওয়া যায় 'একটু হাওয়া' গল্পে। যেখানে কামনার লেশমাত্র পরিচয় নেই। সদ্য মুকুলিত দুটি হৃদয় পুষ্পের অন্তরানুভূতির অনাবিল উদ্ভাস প্রকাশিত হয়েছে গল্প বর্ণনার পরতে পরতে।

> "মনে পড়ল থুবানের নাম দিয়েছিলাম থেবি। থেবি আমাদের ছেলেবেলাকার বান্ধবী ছিল। আমার বয়স তখন দশ, থেবির পাঁচ বা ছয়। বড়োবিনুনি করে চুল বাঁধত। পরত একটা ছিটের ফ্রক। বেড়ালের মতো গোল মুখ ছিল তার। গড়নটি থ্যাবড়া-থোবড়া। দুজনে একসঙ্গে নানারকম খেলা করেছি। কানা-মাছি-চোর-চোর আরও কত কি। তারপর থেবির বাবা বদলি হয়ে গেলেন। থেবি হারিয়ে গেল আমার জীবন থেকে।"[১০]

ছেলেবেলার হারানো প্রেম জীবনাকাশে মেঘে ঢাকা তারা হয়েছিল। সময়ের পথ আপন গতিতে জীবনের মধ্যগগনে এসে পৌঁচেছে। সেখানে কেবলই নিদারুণ বাস্তবের কঠিন পথ। হঠাৎ এক মহিলা এল গল্প কথকের সম্মুখে।

> "আমাকে চিনতে পারেন?
> অন্ধকারে কিছু দেখতে পাচ্ছি না।"[১১]

এ 'অন্ধকার' বিস্মৃতির অন্ধকার। এখানে অন্ধকার Irony বহন করে আনে। সেই অন্ধকার পেরিয়ে হঠাৎ গল্প কথক শুনতে পান—

> "আমি থেবি। আজকাল স্কুল ইন্সপেকট্রেস হয়েছি। যা গরম। ওয়েটিং রুমে পাখার তলায় বসেছিলাম তারপর দেখলাম একটু হাওয়া উঠেছে ভাবলাম যাই আপনার সঙ্গে দেখা করে আসি। মনে আছে কি আপনার থেবিকে?"[১২]

বনফুলের গল্পে অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় প্রেম রোম্যান্টিক ভাবাতুলতা বা আবেশের আবহ রচনা করেনি। জীবনের খণ্ড খণ্ড চিত্রের মধ্য দিয়ে ভালোবাসার শাশ্বত উপলব্ধির মূহূর্তকে তাঁর গল্পের বর্ণনীয় বিষয়বস্তু করে তুলেছেন। জীবনলগ্ন অভিজ্ঞতাই তাঁর প্রেমমূলক গল্পগুলিতে বিচিত্র উদ্ভাসের সৃষ্টি করেছে। 'তুচ্ছঘটনা' 'যুগলস্বপ্ন' 'ভ্রষ্টলগ্ন' 'জৈবিকনিয়ম' 'যূথিকা' 'তপন' 'প্রজাপতি' অলক্ষ্যে 'চঞ্চলা' গল্পগুলির অনবদ্য বর্ণনভঙ্গী পাঠকের দরবারে প্রেমের বিচিত্র স্বরূপের আস্বাদ নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। এর মধ্যে কয়েকটি গল্পকে সীমিত পরিসরে আলোচনা করা যেতে পারে। 'যুগল স্বপ্ন' গল্পটিতে চারজন- দুই যুগল নরনারী, সুধীর ও হাসি, অলকা ও অজয় পরস্পরকে নিয়ে ভালোবাসার স্বপ্ন রচনা করে। কিন্তু গল্পের শেষে দেখা যায় হাসি ও অজয় পরস্পরকে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে সংসারের স্বপ্ন রচনা করে। রবীন্দ্রনাথ 'শেষের কবিতা' উপন্যাসে লিখেছিলেন প্রেমের কল্পনাভিসারে অবগাহন আর বাস্তবের ধূলিমলিন জগতের যাপিত জীবনের পথ ভিন্ন। তা বড় বেশি করে সত্য হয়ে ওঠে এই গল্পে ভিন্ন বাচনভঙ্গীতে।

'জৈবিক নিয়ম' গল্পটি বিষয় ভাবনার নতুনত্বে অনবদ্য আবেদন সৃষ্টি করে। সাবলীল বাচনভঙ্গিতে জীববিজ্ঞান ও মনস্তত্ত্বের জটিল তত্ত্বকে বনফুল বর্ণনা করেছেন গল্পারম্ভে। অনায়াস ভঙ্গিতে জীবনের স্বরূপকে উপস্থাপনই বনফুলের লেখনীর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। জীবানানুভবের জটিলতম রূপের সহজতম উপস্থাপনে তিনি সিদ্ধহস্ত।

> "জৈবিক নিয়ম অনুসারে যৌবনের ধর্ম এই। মনে হয় বুকটা একটু ফুলাইয়া চলি, মাথাটা একটু উঁচাইয়া রাখি। হাব-ভাবে, চলনে-বলনে পৌরুষের মাহাত্ম্যটা পরিস্ফুট হইয়া উঠুক। মেয়েটি তাহা দেখুক অনুভব করুক, একবারও অন্তত মনে মনে ভাবুক- বাঃ, বেশ ছেলেটিতো! অকারণে কানের পাশ গরম হইতে থাকে, পেশিগুলির মধ্যে শিহরণ সঞ্চারিত হয়, শিরায় শিরায় শোণিত-স্রোতের গতিবেগ বাড়িয়া যায়। যৌবনকালে সকলেরই ইহা হয়। ইহাই নিয়ম। যৌবনের ধর্মই এরূপ বিচিত্র যে, বাহুল্য ও আতিশয্যেই তাহার সহজ প্রকাশ। কারণে অকারণে নিজেকে সাড়ম্বরে বিজ্ঞাপিত না করিতে পারিলে সে স্বস্তি পায় না। সকলেই তাই। নিজস্ব ধরনে নিজস্ব ভঙ্গিতে, নিজস্ব রুচি অনুসারে করে।"[১৩]

অকারণ কাব্যধর্মিতার পথ সযত্নে পরিত্যাগ করে চিকিৎসক বনফুল নিজস্ব নিরীক্ষনী দৃষ্টিভঙ্গিতে মানবদেহে যৌবন আগমনের বৈশিষ্ট্যগুলিকে চিত্রিত করেছেন। যৌবনে জৈবিক নিয়মের তাড়নায়, গল্পে বর্ণিত যুবকটি একটি মেয়ের মন জয় করতে চায়। নিজের চরিত্রের বাহুল্য দেখানোর জন্য প্ল্যাটফর্মে দাঁড়ানো মেয়েটির সামনে চলন্ত ট্রেনে উঠতে গিয়ে পা ফসকে একেবারে চাকার নীচে পড়ে যায় যুবকটি। পূর্ণ বসন্ত অকালে ঝরে যায় নিয়তির নিষ্ঠুর পরিহাসে। গল্পের শেষে চরিত্রের এরকম ট্রাজিক পরিণতি বনফুলের পক্ষেই সম্ভব।

একই বিষয়বস্তুকে কেন্দ্র করে বিবিধ situation তৈরি করা বনফুলের লেখনীর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। 'জৈবিক নিয়ম' গল্পটির বিপরীতধর্মী গল্প হল 'যূথিকা"। উত্তম পুরুষে বর্ণিত গল্পটিতে প্রেমের মিঠে রূপ প্রকাশিত। একদিকে যৌবনে প্রেমিক হৃদয়ের আকুতি, আর অন্যদিকে প্রেমিকার চপলতা গল্পটিকে স্বতন্ত্র মাধুর্য দান করেছে।

প্রকৃতির রূপ-রস-গন্ধ মানব জীবনে বেঁচে থাকার রসদ জোগায়। সুশোভিত উদ্যান অন্তরের প্রশান্তি বৃদ্ধি করে। সৌন্দর্যাবেশে মন হয় অভিভূত। মানুষ তাকে যত্ন করে গড়ে তোলে নিজের জন্য। অন্যদিকে অরণ্যানীর মাতাল সমীরণ মন দরিয়ায় মাদকতা নিয়ে আসে। শরীরে সৃষ্টি হয় অকারণ চঞ্চলতা। সমগ্র সত্তা আবিষ্ট হয় দয়িতের পথ পানে চেয়ে। নর-নারী তাদের প্রেম যাপন করে প্রকৃতির আকুল আহ্বানের মধ্যে—

> "আবার এল দখিন হাওয়া, আবার এল ভ্রমরের দল, আবার এল সূর্যকিরণের আহ্বান, প্রতিবেশীদের মিনতি। দেহের শিরায় উপশিরায় সঞ্চারিত হল রসাবেগ। অবরুদ্ধ সৌরভ মথিত করে তুলতে লাগল উন্মুখ চেতনাকে।"[১৪]

'অলক্ষ্যে' গল্পে অরণ্য প্রকৃতির মাঝে সুখীয়া-ভিকুর-প্রেম যাপনের চিত্র পাঠকের অন্তর জগতেও উদ্বেলতার সঞ্চার করে, তারা নিজ প্রেমানুভূতিতে আত্মমগ্ন।

অনতিগম্য বিবিধ মানব-অনুভূতির একটি অংশ রূপে প্রেমকে দেখা যায়। অনুভূতির বিচিত্র ক্রিয়া প্রতিক্রিয়াই পরিগণিত হয় মনস্তত্ত্ব রূপে। মানব চরিত্রের নানান বিপরীতমুখী ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার জটিল আবর্ত নিয়ে দার্শনিক ও মনস্তাত্ত্বিকরা গবেষণা করে চলেছেন। তা সত্ত্বেও বলা যায় কবি, সাহিত্যিকরা মানব মনস্তত্ত্বকে সবচেয়ে বেশী পর্যবেক্ষণ করেন। মানব চরিত্রের মনস্তত্ত্বকে সম্যক অনুধাবন করতে না পারলে সাহিত্যে সার্থক চরিত্রয়ান সম্ভব নয়। বনফুলের সাহিত্যসম্ভার যেন মানব চরিত্রের মেলা। সেখানে জটিল কোনো ভাবনা নেই। কিন্তু মানব মনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অনুভূতি ছোট ছোট স্কেচের মাধ্যমে গল্পের বিষয় রূপে উঠে এসেছে।

বিবাহ-পূর্ববর্তী নারী পুরুষের প্রেমজ সম্পর্ক এবং তার সামাজিক পরিণতি না পাওয়া নিয়ে বনফুল লিখেছেন 'চিঠি পাওয়ার পর' গল্পটি। গল্পটির বিষয় প্রেমভাবনা হলেও গল্পে, প্রেমিক-প্রেমিকার মনস্তাত্ত্বিক টানাপোড়েন গল্পটির শরীর নির্মাণকে অনেক বেশী অভিনবত্ব দান করেছে। বনফুলের অন্যান্য অনেক গল্পের মতো গল্প কথকই গল্পের বর্ণনা দিয়েছেন। প্রেমিকা অমিতাকে তিনি বিয়ে করেননি শারীরিক অসুস্থতার জন্য। কিন্তু তাঁর বিশ্বাস—

> "আমার ধারণা, অমিতা আমাকে পাইলে বেশী সুখী হত।"[১৫]

গল্প কথকের ধারণা সত্যি হয়ে অমিতা পাঁচমিনিটের জন্য পাটনা স্টেশনে দেখা করতে চেয়েছে। লক্ষ্মৌ যাওয়ার পথে। চিঠি পেয়ে গল্প কথকের সমগ্র প্রেমিক সত্তা বলে উঠেছে—

> "ভুলি নাই একদণ্ডের জন্যও তোমাকে ভুলি নাই। ভুলিতে পারি না।"[১৬]

প্রেমিকা অমিতা ভালোবেসেছেন একপুরুষকে কিন্তু বিবাহিত জীবনযাপন করেছেন অন্য পুরুষের সঙ্গে। বিয়ের পরও তিনি ভুলতে পারেননি অতীতের প্রেম সম্পর্কের বর্ণসুষমাকে। নিজের Id প্রবৃত্তিকে অবদমন করে অন্য ব্যক্তির সঙ্গে নিরন্তর অভিনয় করে চলেছেন সুস্থ মানসিক সম্পর্কের। সেইজন্যই হয়ত গল্পটি উত্তম পুরুষে বর্ণনা করা হয়েছে। সমাজজীবনে আমরা নিজেদের ব্যক্তিগত ইচ্ছেকে অবদমন (suppress) করে জীবনযাপনে অভ্যস্ত হই। এই অবদমন থেকে শুরু হয় মানসিক টানাপোড়েন। অপূর্ণ প্রেমজ সম্পর্ককে অমিতা ভুলতে পারেনি। আবার স্বামীর প্রতি সম্পূর্ণ সমর্পিত হতে পারেনি। আমাদের যাপিত জীবন কি শুধুই অভ্যাস? ভালোবেসে জীবনের ঘ্রাণকে আমরা ক'জন উপলব্ধি করি। সাবলীল বর্ণনায় অমিতার মনের দোলাচলতা গল্পে চিত্রিত হয়েছে।

বহুমুখীনতা মানব চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। নবেন্দু ও সুরেন কে কেন্দ্র করে 'নারীর মন' গল্পে সুমিতার প্রেম-যাপনের চিত্র উঠে এসেছে। তার সঙ্গে দুই পুরুষ চরিত্রকে কেন্দ্র করে সুমিতার মনস্তাত্ত্বিক টানাপোড়েন সৃষ্টি হয়েছে। স্বল্প রোজগেরে সুমিতা তার আর্থিক অস্বচ্ছলতাকে নিবারণ করতে মনের মধ্যে বিয়ের ইচ্ছে পোষণ করেছে। কিন্তু পরমুহূর্তে সুরেনকে কড়াভাবে জবাব দিয়েছে—

> "আমি যতদিন পর্যন্ত ভালোভাবে রোজগার করতে না পারি ততদিন বিয়ে করব না ঠিক করেছি। কারো গলগ্রহ হবার ইচ্ছে নেই।"[১৭]

দুই পুরুষকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে সুমিতার মন-দ্বন্দ্ব (inner-conflict)। সুরেন আর নবেন্দুর মাঝে শেষপর্যন্ত নবেন্দুকেই নির্ধারণ করেছে সুমিতা।

বনফুলের হাতে মানব মনের বিচিত্র রূপ কদাকার হয়ে ওঠেনি। তবে প্রেমকে ঘিরে গভীর বিষাদের ছবি এঁকেছেন 'ধনী-দরিদ্র' গল্পে। 'চিঠি পাওয়ার পর' গল্পে প্রেমিকার প্রিয় জিনিস আহরণের উৎসাহে প্রেমিক ঘড়িতে দম দিতে ভুলে গিয়েছিল। তারফলে তার মনে নেমে এসেছিল বিষাদের ছায়া। 'ধনী-দরিদ্র' গল্পে মহেশ দাশের জীবনে নেমে এসেছে বিষাদের ছায়া। গল্পের মধ্যে মানব মনের নানান স্কেচ ফুটে উঠেছে সহজ ভাষায় বর্ণনার মধ্য দিয়ে।

বিধবা মায়ের একমাত্র ছেলে ধনী নির্মলশঙ্করের মেয়ে জয়শ্রীকে প্রথমে বিয়ে করতে রাজী হননি।

> "নির্মলশঙ্করবাবু নিজে আরও দুবার এলেন, লোক পাঠালেন কয়েকবার। দরিদ্র মহেশের ক্ষুধিত অহংকারটা তৃপ্ত হল বোধহয়, কিংবা হয়তো আরও কিছু...। রাজি হয়ে গেল শেষপর্যন্ত"[১৮]

স্ত্রী জয়শ্রীর সঙ্গে অবনীর ঘনিষ্ঠতা চোখ এড়ায় নি মহেশ দাশের। কিন্তু যখন সে শুনল তাকে না জানিয়ে জয়শ্রী অবনীর সঙ্গে দেখা করেছে তখন সে নিজেকে ঠিক রাখতে পারেনি। বিবাহিত স্ত্রীর তার প্রতি অবহেলা— মহেশের সমস্ত সত্তা প্রতিবাদ করে উঠল—

> "রাত্রে ঘুম এল না। কিছুতেই এল না। ক্রমাগত এপাশ ওপাশ করতে লাগল সে। অবনী সেন? কী এমন আছে লোকটার মধ্যে। চেহারা ভালো, ভালো বাঁশিও বাজাতে পারে। তাতে কী! জয়শ্রী অবনীকে খবর দিয়েছে মৃণালপুরে যাবার জন্যে, অথচ তাকে কিছু লেখেনি, এর মানে কী? সে যে সিমলা থেকে চলে এসেছে এ খবরই তো জানে না সে! আশ্চর্য!"[১৯]

জামাই হিসেবে নিজের সম্মানবোধকে বিসর্জন দিয়ে জয়শ্রীর বাপের বাড়ি গিয়ে অবনীর বাঁশির সুরে জয়শ্রীর গান শুনতে পায়। তপ্ত হৃদয় বহ্নি দাহে অন্তরের চেতনাবোধ লুপ্ত প্রায় মহেশের। লোহার গেট টপকে লুকিয়ে বাড়িতে ঢুকতে গিয়ে বাড়ির পোষা অ্যালসেশিয়ান কুকুরের কামড়ে মারা যায় মহেশ। অবনী সেনের প্রতি প্রেমানুরক্ত জয়শ্রী মন থেকে মহেশকে মেনে নিতে পারেনি। নিয়তির বিড়ম্বনায় মহেশ দাসের জীবনে নেমে এসেছে নির্মম পরিণতি।

'তপন' গল্পের ট্র্যাজিক পরিণতি একটু ভিন্ন প্রকৃতির। দেশের জন্য সমর্পিত তপন ব্যক্তি প্রেমকে হারিয়েছিল। চপলা তপনের জন্য অপেক্ষার প্রহর না গুনে রায় বাহাদুরের গলায় বরমাল্য দান করে। তপন জেল থেকে ফিরে চপলার সঙ্গে জীবনের সূত্র রচনার জন্য উপস্থিত হয়। প্রেমের স্বীকারোক্তি সত্ত্বেও "চপলার কণ্ঠস্বর কাঁপিয়া গেল।"[২০] অনুভবী তপন একদা মনসঙ্গী চপলার হৃদয় অনুরণনকে বুঝতে পেরে জীবনের গতিকে ভিন্ন পথগামী করে। নারী হৃদয়ের মর্মমথিত বেদনার আলেখ্য রচনায় রবীন্দ্রনাথ অতুলনীয়, সর্বকালের শ্রেষ্ঠ শিল্পী। জগদীশ গুপ্তের গল্পে প্রেমের স্নিগ্ধ রূপ অনুপস্থিত। তাঁর গল্পে প্রেম যৌনতা নির্ভর ও বিকৃত কামানা আশ্রয়ী। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পে ফ্রয়েডীয় তত্ত্বানুসারী নর-নারীর জৈবিক আকর্ষণের বিচিত্র বিন্যাসই প্রেমের রূপকল্প বিধৃত। সেই সঙ্গে মানব মনের তমোগহনের বিসর্পিল কূটৈষণা ও মনোবিকলনই তাঁর গল্পের প্রধান আশ্রয়। সুবোধ ঘোষ মানব চরিত্রের গহন অলিন্দে পদচারণা করলেও মানিকের মতো মনোবিকলনের আবর্তে তলিয়ে না গিয়ে বিচিত্রস্বাদী স্বার্থক প্রেমের গল্প লিখেছেন। তাঁর গল্পে প্রেম আসে নিঃশব্দ চরণপাতে, শিউলীফুলের মতো, জ্যোৎস্নার ভোরের মতো। সমালোচকের মতে এই মন্তব্য সার্থক।

বনফুল সমকালে রুক্ষতার মধ্যেও জীবনকে ভালোবেসেছেন তার ছায়াতলে বসে। আমাদের সনাতনী ধারণার ভেতরে মনের বিচিত্র জটিলরূপ দোলাচলতা, নিরন্তর লুকিয়ে থাকে— একথা স্বীকার্য। কিন্তু এসবের মধ্যেও বনফুলের প্রকৃতির মতো মিঠে ভাবটি প্রকাশ পেয়েছে তাঁর বর্ণনায়।

**তথ্যসূত্র:**


১. মজুমদার, বিমানবিহারী (সম্পা.), চণ্ডীদাসের পদাবলী, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা- ৬, পৌষ, ১৩৬৭, পৃ. ১৮।

২. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, গীতাঞ্জলি, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা, ১৯১০, পৃ. ৩৮৩।

৩. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, সোনার তরী, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা, ১৩০০ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১০১।

৪. মুখোপাধ্যায়, বলাইচাঁদ, বনফুলের ছোটোগল্প সমগ্র (প্রথম খণ্ড), বাণীশিল্প, কলকাতা, চতুর্থ সংস্করণ: মে ২০১৯, পৃ. ৪৭।

৫. তদেব, পৃ. ৪৭।

৬. শ্রীমদ্ভগবদগীতা, গীতা প্রেস, গোরক্ষপুর, পৃ. ১৩।

৭. মুখোপাধ্যায, বলাইচাঁদ, বনফুলের ছোটোগল্প সমগ্র (প্রথম খণ্ড), বাণীশিল্প, কলকাতা, চতুর্থ সংস্করণ: মে ২০১৯, পৃ. ১৫০।

৮. তদেব, পৃ. ২৪৪।

৯. মুখোপাধ্যায়, বলাইচাঁদ, বনফুলের ছোটোগল্প সমগ্র (দ্বিতীয় খণ্ড) বাণীশিল্প, কলকাতা, চতুর্থ সংস্করণ: জানুয়ারি ২০১৬, পৃ. ৬৮৬।
১০. তদেব, পৃ. ৬৩১।
১১. তদেব, পৃ. ৬৩১।
১২. তদেব, পৃ. ৬৩১।
১৩. মুখোপাধ্যায়, বলাইচাঁদ, বনফুলের ছোটোগল্প সমগ্র (প্রথম খণ্ড), বাণীশিল্প, কলকাতা, চতুর্থ সংস্করণ: মে ২০১৯, পৃ. ১৭৬।
১৪. তদেব, পৃ. ৫১৫।
১৫. তদেব, পৃ. ১৮৭।
১৬. তদেব, পৃ. ১৮৭।
১৭. তদেব, পৃ. ৬৫১।
১৮. তদেব, পৃ. ৬৯২।
১৯. তদেব, পৃ. ৬৯৫।
২০. তদেব, পৃ. ২৭০।